**শিক্ষা**

শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শারীরিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শিক্ষা শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করলে শারীরিক শিক্ষা কী তা বোঝা সহজ হবে। শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি নানাভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা বিভিন্ন অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নয়, ব্যক্তির শারীরিক, সামাজিক, আবেগিক ও অন্যান্য দিকেরও সুষম বিকাশ সাধন করে। শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়েই ঘটে না, শিক্ষা জীবনব্যাপী বিস্তৃত। শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা অর্জিত হয় বাড়িতে, সমাজে, খেলার মাঠে এবং সর্বত্র।

শারীরিক শিক্ষা ও শিক্ষার সম্পর্ক সম্বন্ধে সি. এ. বুচার (C.A.Bucher) বলেছেন- ‘শারীরিক শিক্ষা, শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শারীরিক শিক্ষা হলো সুনির্দিষ্ট শারীরিক কাজকর্মের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা।’ এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক।

**ডি. কে. ম্যাথিউস বলেছেন**, শারীরিক কার্যকলাপের দ্বারা অর্জিত শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা।

**হপ স্মিথ ও ক্লিফটন বলেছেন**, বিজ্ঞানসম্মত ও কৌশলগত অঙ্গসঞ্চালনের নাম শারীরিক শিক্ষা।

**জে. বি. ন্যাশের ভাষায়**, ‘শারীরিক শিক্ষা গোটা শিক্ষার এমন একদিক যা মাংসপেশির সঠিক সঞ্চালন ও এর প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যক্তির দেহের ও স্বভাবের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে।

**শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য**

শারীরিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করা, সুস্থদেহে সুন্দর মন গড়া। শারীরিক শিক্ষার প্রধান কাজ হলো শিশুকে আনন্দ ও খেলাধূলার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা। বিভিন্ন শারীরিক শিক্ষাবিদগণ শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করেছেন।

উইলিয়ামস-এর মতে, ‘শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির শারীরিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিকের সুষম উন্নতি ঘটিয়ে ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা’।

বুক ওয়াল্টার বলেছেন ‘শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিক সমূহের সুসমন্বিত বিকাশ সাধন।’ এই বিকাশ সাধনের উপায় হলো স্বাস্থ্যবিধি মেনেচলা ও নিয়মনীতি অনুসারে পরিচালিত খেলাধুলা, ছন্দোময় ব্যায়াম এবং জিমন্যাস্টিকস্ ইত্যাদি ক্রিয়াক্রর্মে অংশগ্রহণ।

এম. জি. ম্যাসন ও এ. জি. এল ভেল্টার বলেছেন-

১. শিশুকে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাকে সুস্থভাবে গড়ে তোলা।

২. শিশুর সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো।

৩. সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।

৪. নৈতিক, আবেগিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক গুণাবলি অর্জনে অনুপ্রণিত করা।

৫. খেলাধুলার মাধ্যমে নেতৃত্বদানের গুণাবলি অর্জন করা।

**শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য**

সাধারণভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই ধারণার মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। অনেক সময় একের জায়গায় অন্যটিকে ব্যবহার করি। কিন্তু এই দুই ধারণা সমার্থক নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল আর উদ্দেশ্য হলো সেই গন্তব্যস্থলে পৌছানোর সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ। যেমন- সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠার ক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো ছাদ, আর সিঁড়ির এক একটি ধাপ হলো উদ্দেশ্য। লক্ষ্যের অস্তিত্ব মানুষের কল্পনায়, তার রুপায়ণ সম্ভব হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো বাস্তব। মানুষ উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে এমনকি তার পরিমাপও সম্ভব। শারীরিক শিক্ষাবিদগণ শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বেশ কয়েকটি অন্তর্বর্তী পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোই শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষজ্ঞগণ কিছু উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হলেও কিছু উদ্দেশ্য নিযে মতের ভিন্নতাও প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। বিভিন্ন  চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা-

১. শারীরিক সুস্থতা অর্জন।

২. মানসিক বিকাশ সাধন।

৩. চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন।

৪. সামাজিক গুণাবলি অর্জন।

**১. শারীরিক সুস্থতা অর্জন**

ক. খেলাধুলার নিয়মকানুন মেনে ভালো করে খেলতে পারা।

খ. কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল করা।

গ. স্নায়ু ও মাংসপেশির সমন্বয় সাধনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ঘ. দেহ ও মনের সুষম উন্নতি করা।

ঙ. সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করা।

চ. সহিষ্ণুতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা।

**২.মানসিক বিকাশ সাধন**

ক. উপস্থিত চিন্তাধারার বিকাশ সাধন।

খ. নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

গ. সেবা ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

ঘ. বিভিন্ন দলের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠা।

**৩. চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন**

ক. আনুগত্যবোধ ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পাওয়া।

খ. খেলাধুলার মাধ্যমে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হওয়া।

গ. খেলোয়াড় ও বন্ধুত্বসূলব মনোভাব গড়ে ওঠা।

ঘ. প্রতিদ্বন্ধীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব গড়ে ওঠা।

ঙ. আত্মসংযমী হওয়া ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।

**৪. সামাজিক গুণাবলি অর্জন**

ক. নেতৃত্বদানের সক্ষমতা অর্জন ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করা।

খ. বিনোদনের সাথে অবসর সময় কাটানোর উপায় জানা।

গ. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা

ঘ. সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

শারীরিক শিক্ষাবিদদের মতামত থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষার মতোই ব্যক্তিসত্তার সর্বোচ্চ ও সুষম বিকাশ সাধন করে থাকে এবং পরিকল্পিতভাবে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জনে সাহায্য করে।

**শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা**

শারীরিক শিক্ষা দেহ ও মনের সামঞ্জস্য উন্নয়ন সাধন করে। শারীরিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার পূর্ণতা আসে না। যে সব গুণ থাকলে দেশের প্রতিটি নাগরিক সুস্থ ও সবল ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে এবং নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়, শারীরিক শিক্ষা সেই গুণাবলি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মানুষ সমাজে স্বীকৃতি পেতে চায়। এই স্বীকৃতির মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাই নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব গঠনেও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। আমাদের দেহ কতকগুলো অঙ্গের সমষ্টি। আবার প্রত্যেকটি অঙ্গ নানারূপ মাংসপেশি, হাড়, শিরা, ধমনি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। দেহকে ঠিক রাখার জন্য সব সময়ই দেহের মধ্যে কতকগুলো প্রক্রিয়া কাজ করছে। এই প্রক্রিয়াগুলো সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। উপযুক্ত খাবার, অঙ্গ সঞ্চালন, বিশ্রাম ও ঘুম এইগুলির অভাবে শরীর সঠিকভাবে বৃদ্ধি পায় না ও সুস্থ থাকে না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করছে।

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা**

বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো-

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজ সংরক্ষণ, সমাজ সংস্কার ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ ও দেশের কাছে দায়বদ্ধ। দেশের মানব সম্পদকে সঠিকভাবে বিকশিত করা এবং আজকের শিশুকে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ মূলত দ্বিমুখী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হলো শিশু-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ সাধন। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক দিক অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয় কাজ হলো শিক্ষার্থীর জৈবিকসত্তাকে সামাজিক সত্তায় রূপান্তরিত করা। এর মধ্যে শিশুর চারিত্রিক ও মূল্যবোধের উন্নতি এবং সামাজিক বিকাশ অন্তর্ভুক্ত।

এই কাজের মধ্যে প্রথমটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাজ এবং দ্বিতীয়টি তার পরোক্ষ দায়িত্ব। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। মাসলো-এর মতে শিক্ষার্থীর  এই প্রয়োজন তিনটি স্তরে বিন্যস্ত যেমন-

১. শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন (Biological need)

২. মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতার প্রয়োজন (Psychological need)

৩. সামাজিক প্রয়োজন (Social need)

**১. শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন**: শিক্ষার্থীর শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন পূরণে শারীরিক শিক্ষা প্রত্যক্ষ কাজ করে। এ ব্যাপারে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা হলো-

ক. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর গতিশীল কাজের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করে।

খ. শিক্ষার্থীর দৈহিক গঠন সুন্দর ও মজবুত করে।

গ.শিক্ষার্থীর শারীরিক সক্ষমতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ঘ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ঙ. শিক্ষার্থী খেলাধুলার কৌশল শেখার মাধ্যমে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন করে।

চ. শারীরিক শিক্ষা সুস্থ মনের জন্য সুস্থ দেহ গড়ে তোলে।

**২. মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতা প্রয়োজন**

ক. শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিমত্তার ভিত গড়ে তোলে।

খ. পড়াশোনার একঘেয়েমি দূর করে।

গ. শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

ঘ. আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা, আত্মোপলদ্ধি ও আত্মসম্মান বাড়িয়ে তোলে।

ঙ. পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে সাহয্য করে।

চ. শিক্ষার্থীর মনে সৃজনশীলতার অনুভূতি জাগ্রত করে।

ছ. ক্ষতিকর নেশা থেকে দূরে রাখে।

জ. চিত্তবিনোদন ও অবসর সময় কাটানোর উপায় নির্বাচনে সাহায্য করে।

**৩. সামাজিক প্রয়োজন**

ক. প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে।

খ. খেলাধুলায় সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে ও মানসিক গুণ অর্জনে সহায়তা করে।

গ. শারীরিক শিক্ষা নেতৃত্বদানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

ঘ. দেশ ও সমাজের সাংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটায়।

ঙ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

চ. শিক্ষার্থীর উদার মানসিকতা ও সমাজের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে।

**নীতি**

নীতি হলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ঐতিহাসিক তথ্য এবং দার্শনিক মতবাদপুষ্ট মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও মতবাদ। নীতি গড়ে ওঠে বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং নীতি ব্যবহৃত হয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। নীতি সংজ্ঞায় ব্যারো বলেছেন- Principles may be defined as truths or general concepts based on facts and used as guider for taking action and making choices. বাস্তব সত্যঘটনা ও সাধারণর ধারণার উপর ভিত্তি করে নীতি ব্যবহৃত হয় যা পছন্দ মতো কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠা নীতি সাধারণভাবে সবার ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য এবং এই নীতি সহজে পরিবর্তন হয় না। তবে মনে রাখতে হবে নীতি চিরন্তন নয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন তত্ত্ব বা তথ্যের প্রভাবে নীতি সংশোধিত ও পরিবর্তিত হতে পারে। তবে আপেক্ষিকভাবে নীতি অপরিবর্তনীয়। নীতির গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষিত হয় তার প্রয়োগ ও কার্যকারিতার উপর।

**শারীরিক শিক্ষায় নীতি**

উৎসের প্রকৃতি অনুসারে শারীরিক শিক্ষার নীতিসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলো হলো-

১. জীব বৈজ্ঞানিক নীতি (Biological Principles)

২. মনোবৈজ্ঞানিক নীতি (Psychological Principles)

৩. সমাজ বৈজ্ঞানিক নীতি (Sociological Principles)

৪. জীব বলবিদ্যার নীতি (Biochemical Principles)

৫. দার্শনিক নীতি (Philosophical Principles)

**১. জীব বৈজ্ঞানিক নীতি**: জৈবিক দিক নিয়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতোই জীবিত এক প্রাণী। বিবর্তনের ফলে বর্তমানে মানুষের উন্নত জৈবিক রূপ সৃষ্টি হয়েছে। জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্যান্য জীবের মতোই মানুষের প্রয়োজন- খাদ্য, বিশ্রাম ও শারীরিক পরিশ্রেমের। শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে গৃহীত কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য নীতি হলো-

(ক) শারীরিক ব্যায়াম প্রাণের জৈবিক ভিত্তি। শারীরিক ব্যায়ামের সাহায্যে পেশিসমূহ দেহের সমস্ত অঙ্গ ও তন্ত্রের সক্ষমতা, সুস্থতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে বেড়ে ওঠে। তাই জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম প্রয়োজন।

(খ) মানব দেহের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা ব্যায়ামের মাধ্যমে বাড়ে। যন্ত্রনির্ভর যুগে কায়িক পরিশ্রম কমে যাওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পিত শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন বেড়েছে। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ব্যায়াামের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপরে যথাযথ গুরত্ব দেওয়া দরকার।

(গ) মানুষের শারীরিক গঠন, দৈহিক উচ্চতা পেশির প্রকৃতি, স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষত্ব এগুলো বংশগতির উপর নির্ভর করে। প্রশিক্ষণের সাহায্যে শরীরে এই সমস্ত দিকের বিশেষ পরিবর্তন সম্ভব হয়। খেলোয়াড় নির্বাচনের সময় এই নীতির কথা মনে রাখা দরকার।

(ঘ) ব্যক্তির সামগ্রিক শারীরিক বৈশিষ্ট্য বংশগত ও পরিবেশের জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। তাই বংশগতির যথাযথ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(ঙ) শারীরিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্ষমতায় নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম তৈরির সময় এই নীতির কথা মনে রাখা দরকার।

(চ) বুদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের হার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের। বিদ্যালয়ের শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার প্রধান উপায় হলো শারীরিক ব্যায়াম।

(ছ) শারীরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির ও শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার প্রধান উপায় হলো শারীরিক ব্যায়াম।

(জ) ব্যায়ামের প্রকৃতি অনুসারে শারীরিক সক্ষমতার বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। তাই শক্তি (Strength), ক্ষমতা (Power), দম (Endurance) প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণসূচির প্রয়োজন হয়।

**২. মনোবৈজ্ঞানিক নীতি**: মনোবিজ্ঞান হলো ব্যক্তির ব্যবাহারের বিজ্ঞান যা মনের সাথে সম্পর্কিত। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে ব্যক্তির খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার সময়কাল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। মনোবিজ্ঞান হতে গৃহীত মুলনীতিগুলো হলো-

ক. শারীরিক শিক্ষাকর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে শিশুর শারীরিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশও ঘটে।

খ. ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পরের সাথে সর্ম্পকযুক্ত।

গ. শিশুর মনোযোগ ও আগ্রহ খেলাধুলার কৌশল শেখাতে সাহায্য করে।

ঘ. শিশুর খেলাধুলা শেখা ও শিখনের সূত্রানুযায়ী ঘটে।

ঙ. কোন কিছু শেখার জন্য শিশুর মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

চ. খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

ছ. খেলাধুলায় অংশগ্রহণের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

জ. খেলাধুলা শিশুর জ্ঞান বিকাশে সাহায্য করে।

ঝ. কোন বিশেষ খেলায় পারদর্শিতা অর্জন একটি বিশেষ ধরনের মানসিক শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সহজ হয়।

**৩. সমাজ বৈজ্ঞানিক নীতি**: মানুষ সামাজিক জীব। শিশুর ব্যক্তিগত শারীরিক বিকাশের সাথে এই নীতি সামাজিক গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গৃহীত এবং শারীরিক  শিক্ষায় ব্যবহৃত মূলনীতিগুলো হলো-

ক. শিশু সামাজিক জীব হিসেবে জন্মায় না। উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ তার সামাজিকীকরণ ঘটে।

খ. খেলাধুলার মাধ্যমে সামাজিক গুণাবলি ও বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে।

গ.খেলার মাঠে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ দূর হয়।

ঘ. খেলাধুলা সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক দিকের বিকাশ ঘটায়।

ঙ. খেলাধুলা বিনোদন ও অবসর যাপনের উৎকৃষ্ট উপায়।

**৪. জীববলবিদ্যার নীতি**: বলবিদ্যা হলো কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ও তার প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা। জীববলবিদ্যা বলবিদ্যার এক ব্যবহারিক শখ হিসেবে খেলাধুলায় অংশগ্রহণকালীন শরীরের উপর উপযুক্ত বল ও তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে । এই ক্ষেত্র থেকে গৃহীত মূলনীতিগুলো হলো-

ক.বল/শক্তি প্রয়োগ ছাড়া কোন ব্যায়াম বা খেলাধুলার কৌশল সম্পন্ন করা যায় না।

খ. বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল সর্বদা গতি সৃষ্টি করে।

গ. মানব দেহের বল পেশিসংকোচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

ঘ. স্থিতি ও গতি বস্তুর দুটি প্রাথমিক অবস্থা।

ঙ. খেলাধুলার গতিকার্যে একাধিক বলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে।

চ. মানবদেহে কিছু জৈবিক সীমাবদ্ধতাসহ যান্ত্রিক নিয়মে গতিকার্য সম্পন্ন করে।

ছ. মানবদেহের ভারসাম্যের পরিমাণ অনেকাংশ শরীরের ভরকেন্দ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

**৫. দার্শনিক নীতি** : দর্শননীতি হলো বিশ্বব্রহ্মান্ডের জানা দর্শনের বিভিন্ন শাখা যেমন আদর্শবাদ, প্রকৃতিবাদ, বাস্তববাদ ও প্রয়োগবাদ। এখান থেকে শারীরিক শিক্ষায় গৃহীত মূলনীতিগুলো হলো-

ক. শারীরিক শিক্ষা শুধুমাত্র শরীরের শিক্ষা নয়, ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই হলো শারীরিক শিক্ষা।

খ. শারীরিক শিক্ষায় শিশু কেন্দ্রিকতা গুরুত্বপূর্ণ, বিষয় কেন্দ্রিকতা নয়।

গ. শারীরিক শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মে শিক্ষাদানের উপর জোর দেয়।

ঘ. খেলাধুলা শিশুর শক্তিশালী মাধ্যম।

ঙ. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর বন্ধু ও পথপ্রদর্শক।

চ. শারীরিক শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে শিক্ষা দেয়।

জ. শিশুর শারীরিক সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

**শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচী**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ও বিনোদনমূলক যে সমস্ত কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় তাকে শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি বলে। একজন শারীরিক শিক্ষক যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করেন তাই শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত।

শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. অত্যাবশ্যকীয় কর্মসুচি (Compulsory Service Programme)

২. অন্তঃক্রীড়াসূচি  (Intramural Sports)

৩. আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports)

**১.অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচী (Compulsory Service Programme):** একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারী নির্দেশাবলী, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস, প্রতিযোগিতা, সমাবেশ ও স্থানীয় নির্দেশনা ইত্যাদি সবই অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত। এই কর্মসূচিগুলো একজন শারীরিক শিক্ষকের অবশ্যই পালন করতে হয়। সরকারি নির্দেশনালী বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কৃর্তক জারিকৃত শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক যে সমস্ত নির্দেশনা, যেমন- প্রাত্যহিক সমাবেশ করতে হবে, প্রতিদিন/সপ্তাতে ৩টি ক্লাস নিতে হবে, আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। জাতীয় দিবসগুলোতে খেলাধুলা করাতে হবে ইত্যাদিকে বুঝায়। স্থানীয় নির্দেশনা বলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়মকানুম সমূহকে বুঝিয়ে থাকে যেমন- স্কুল ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা, দৈহিক উন্নতির পরিমাপের পরীক্ষা নেওয়া, টিফিন প্রোগ্রাম পরিচালিত করা ইত্যাদি।

**২. অন্তঃক্রীড়াসূচি (Intramural Sports)** : ইন্ট্রামুরাল একটি ল্যাটিন শব্দ। Intra অর্থ ভিতরে এবং Muralis অর্থ দেয়াল। তাহলে পুরো অর্থ দাঁড়ায় দেয়ালের ভেতরে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের চারি দেয়ালের মধ্যে বা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আকারে যে সমস্ত খেলাধুলা হয় তাকে ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টস বলা হয় । যেমন- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নবম শ্রেণী বনাম দশম শ্রেণী ক্রিকেট ম্যাচ, অথবা যষ্ঠ শ্রেণি ক ও খ শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। যদি হাউজ থাকে তাহলে হাউজে হাউজে যে প্রতিযোগিতা হয় তাও এর আওতায় পড়ে। এ ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক বা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বা ১ম বর্ষ বনাম ২য় বর্ষের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা হয় সেগুলোও ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টসের অন্তর্গত অর্থাৎ নিজেরদের মধ্যে যে খেলাধুলা বা প্রতিযোগিতা হয় তাকে ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টস বলে।

**৩. আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports)** Extra অর্থাৎ বাইরে, Muralis অর্থ দেয়াল র্অথাৎ দেয়ালের বাইরে যে সমস্ত খেলাধুলা হয় তাকে আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports) বলা হয় । যে সমস্ত খেলাধুলা বা প্রতিযোগিতা এক স্কুলের সাথে অন্য স্কুল, এক কলেজের সাথে অন্য কলেজের মধ্যে খেলা হয় তাকে আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলা হয়। যেমন- আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ, আন্তঃক্লাব ইত্যাদি প্রতিযোগিতা বুঝায়। এ সমস্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজ দলের যোগ্যতা যাচাই করা যায়। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় বিভিন্নমানের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করে। ফলে ভালো খেলোয়াড়ের সাহচর্যে এসে তাদের আচার-ব্যবহার, উন্নতমানের কৌশল ইত্যাদি থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দলগত সমঝোতা ও উৎকর্ষ বাড়ে, প্রতিযোগিতার  মনোভাব ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

**বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষা**

বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শারীরিক শিক্ষা বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আগে শারীরিক শিক্ষা বলতে শরীরসম্বন্ধীয় শিক্ষা বুঝানো হতো বর্তমানে শরীর ও মনের বিকাশ সম্পর্কিত শিক্ষাকে শারীরিক শিক্ষা বলে। বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে যা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে। বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষা বিভাগ বলে শিক্ষা ভবনে একটি বিভাগ রয়েছে যার প্রধান হলেন একজন উপ-পরিচালক। এই বিভাগের কাজ হলো-

প্রতি বছরে দুইবার জাতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা এবং মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরের শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের বছরে দুইবার রিফ্রেশার্স কোর্স প্রশিক্ষণ দেওয়া। উপ-পরিচালক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন ফেডারেশনের খেলাধুলা বিষয়ক যে সমঝোতা চুক্তি হয় তার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ২০০২ সালে সেপ্টম্বর মাসে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মধ্যে ভৌত অবকাঠামো, খেলাধুলার ব্যাপকতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আছেন। একজন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রমকে উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে পারেন।

বাংলাদেশে পাঠ্যবই হিসেবে শারীরিক শিক্ষার অবস্থান ও কার্যক্রম নিম্নরূপ-

১.  বাংলাদেশ সরকার ‘শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য’ বিষয়টিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করেছে।

২. নবম ও দশম শ্রেণিতে ২০১৩ সাল থেকে ‘শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা’ বিষয়টি বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্কুলে শারীরিক শিক্ষার উপর পরীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করায় শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩. শারীরিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে বিষয়াদির প্রতি বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং তাদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। এই ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুলে শারীরিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

**শারীরিক শিক্ষার ভিত্তি**

আধুনিক শারীরিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং শিক্ষাশ্রয়ী এক প্রচেষ্টা। তাই এই শিক্ষার কার্যক্রম গড়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিকের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী শারীরিক ও শিক্ষাসূচি প্রণীত হয়। শারীরিক শিক্ষার সঠিক কর্মসূচির প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানব দেহের গঠন ও কার্যাবলি এবং ব্যক্তির সাথে দল ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাই গড়ে ওঠেছে এই শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত জীবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের সমন্বয়ে ।

**১. সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি**:  একজন শিক্ষার্থী শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে এই সামাজিক গুণগুলো অর্জন করবে-

ক. সমাজের সাথে শারীরিক শিক্ষার সম্পর্ক গড়ে তোলা।

খ. সমাজ থেকে শিক্ষা লাভ।

গ. শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজবদ্ধতা।

ঘ. সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।

ঙ. সমাজের মঙ্গল সাধনে শিক্ষা।

**২. মনস্তাত্বিক ভিত্তি**: শারীরিক শিক্ষা মানুষের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে। মনকে বাদ দিয়ে পরিবর্তন সম্ভব নয়। মনস্তত্ত্ব হচ্ছে মনের বিজ্ঞান। মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে হলে মনকে বিভিন্নভাবে জানতে হবে। এখানেই শারীরিক শিক্ষার সাথে মনস্তত্ত্ব তথা শিক্ষা, শিক্ষাগত মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞান শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদানের ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে।

**৩. জীবতাত্ত্বিক ভিত্তি**: জীববিজ্ঞান হলো জীবন এবং জীবিত প্রাণীর বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের তথ্যানুসারে এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য প্রাণীর মতোই বিবর্তনের ফলে। বিবর্তনবাদের আলোকে প্রাণের জৈবিক ভিত্তি দৈহিক গঠন কাঠামো, শারীরিক সক্ষমতা, নারী পুরুষের পার্থক্য, শারীরিক উন্নতি ইত্যাদি বিষয়গুলো শারীরিক শিক্ষার জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তির অন্তর্ভূক্ত।

**শারীরিক শিক্ষার দার্শনিক নীতি**

**দার্শনিক নীতি** : দর্শননীতি হলো বিশ্বব্রহ্মান্ডের জানা দর্শনের বিভিন্ন শাখা যেমন আদর্শবাদ, প্রকৃতিবাদ, বাস্তববাদ ও প্রয়োগবাদ। এখান থেকে শারীরিক শিক্ষায় গৃহীত মূলনীতিগুলো হলো-

ক. শারীরিক শিক্ষা শুধুমাত্র শরীরের শিক্ষা নয়, ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই হলো শারীরিক শিক্ষা।

খ. শারীরিক শিক্ষায় শিশু কেন্দ্রিকতা গুরুত্বপূর্ণ, বিষয় কেন্দ্রিকতা নয়।

গ. শারীরিক শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মে শিক্ষাদানের উপর জোর দেয়।

ঘ. খেলাধুলা শিশুর শক্তিশালী মাধ্যম।

ঙ. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর বন্ধু ও পথপ্রদর্শক।

চ. শারীরিক শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে শিক্ষা দেয়।

জ. শিশুর শারীরিক সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

**শারীরিক শিক্ষার জীববলবিদ্যার নীতি**

**জীববলবিদ্যার নীতি**: বলবিদ্যা হলো কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ও তার প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা। জীববলবিদ্যা বলবিদ্যার এক ব্যবহারিক শখ হিসেবে খেলাধুলায় অংশগ্রহণকালীন শরীরের উপর উপযুক্ত বল ও তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে । এই ক্ষেত্র থেকে গৃহীত মূলনীতিগুলো হলো-

ক.বল/শক্তি প্রয়োগ ছাড়া কোন ব্যায়াম বা খেলাধুলার কৌশল সম্পন্ন করা যায় না।

খ. বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল সর্বদা গতি সৃষ্টি করে।

গ. মানব দেহের বল পেশিসংকোচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

ঘ. স্থিতি ও গতি বস্তুর দুটি প্রাথমিক অবস্থা।

ঙ. খেলাধুলার গতিকার্যে একাধিক বলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে।

চ. মানবদেহে কিছু জৈবিক সীমাবদ্ধতাসহ যান্ত্রিক নিয়মে গতিকার্য সম্পন্ন করে।

ছ. মানবদেহের ভারসাম্যের পরিমাণ অনেকাংশ শরীরের ভরকেন্দ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

**শারীরিক শিক্ষার জীব বৈজ্ঞানিক নীতি**

**জীব বৈজ্ঞানিক নীতি**: জৈবিক দিক নিয়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতোই জীবিত এক প্রাণী। বিবর্তনের ফলে বর্তমানে মানুষের উন্নত জৈবিক রূপ সৃষ্টি হয়েছে। জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্যান্য জীবের মতোই মানুষের প্রয়োজন- খাদ্য, বিশ্রাম ও শারীরিক পরিশ্রেমের। শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে গৃহীত কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য নীতি হলো-

(ক) শারীরিক ব্যায়াম প্রাণের জৈবিক ভিত্তি। শারীরিক ব্যায়ামের সাহায্যে পেশিসমূহ দেহের সমস্ত অঙ্গ ও তন্ত্রের সক্ষমতা, সুস্থতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে বেড়ে ওঠে। তাই জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম প্রয়োজন।

(খ) মানব দেহের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা ব্যায়ামের মাধ্যমে বাড়ে। যন্ত্রনির্ভর যুগে কায়িক পরিশ্রম কমে যাওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পিত শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন বেড়েছে। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ব্যায়াামের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপরে যথাযথ গুরত্ব দেওয়া দরকার।

(গ) মানুষের শারীরিক গঠন, দৈহিক উচ্চতা পেশির প্রকৃতি, স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষত্ব এগুলো বংশগতির উপর নির্ভর করে। প্রশিক্ষণের সাহায্যে শরীরে এই সমস্ত দিকের বিশেষ পরিবর্তন সম্ভব হয়। খেলোয়াড় নির্বাচনের সময় এই নীতির কথা মনে রাখা দরকার।

(ঘ) ব্যক্তির সামগ্রিক শারীরিক বৈশিষ্ট্য বংশগত ও পরিবেশের জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। তাই বংশগতির যথাযথ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(ঙ) শারীরিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্ষমতায় নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম তৈরির সময় এই নীতির কথা মনে রাখা দরকার।

(চ) বুদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের হার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের। বিদ্যালয়ের শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার প্রধান উপায় হলো শারীরিক ব্যায়াম।

(ছ) শারীরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির ও শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার প্রধান উপায় হলো শারীরিক ব্যায়াম।

(জ) ব্যায়ামের প্রকৃতি অনুসারে শারীরিক সক্ষমতার বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। তাই শক্তি (Strength), ক্ষমতা (Power), দম (Endurance) প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণসূচির প্রয়োজন হয়।

**বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা**

বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো-

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজ সংরক্ষণ, সমাজ সংস্কার ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ ও দেশের কাছে দায়বদ্ধ। দেশের মানব সম্পদকে সঠিকভাবে বিকশিত করা এবং আজকের শিশুকে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ মূলত দ্বিমুখী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হলো শিশু-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ সাধন। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক দিক অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয় কাজ হলো শিক্ষার্থীর জৈবিকসত্তাকে সামাজিক সত্তায় রূপান্তরিত করা। এর মধ্যে শিশুর চারিত্রিক ও মূল্যবোধের উন্নতি এবং সামাজিক বিকাশ অন্তর্ভুক্ত।

এই কাজের মধ্যে প্রথমটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাজ এবং দ্বিতীয়টি তার পরোক্ষ দায়িত্ব। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। মাসলো-এর মতে শিক্ষার্থীর  এই প্রয়োজন তিনটি স্তরে বিন্যস্ত যেমন-

১. শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন (Biological need)

২. মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতার প্রয়োজন (Psychological need)

৩. সামাজিক প্রয়োজন (Social need)

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পার্থক্য**

সাধারণভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই ধারণার মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। অনেক সময় একের জায়গায় অন্যটিকে ব্যবহার করি। কিন্তু এই দুই ধারণা সমার্থক নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল আর উদ্দেশ্য হলো সেই গন্তব্যস্থলে পৌছানোর সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ। যেমন- সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠার ক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো ছাদ, আর সিঁড়ির এক একটি ধাপ হলো উদ্দেশ্য। লক্ষ্যের অস্তিত্ব মানুষের কল্পনায়, তার রুপায়ণ সম্ভব হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো বাস্তব। মানুষ উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে এমনকি তার পরিমাপও সম্ভব। শারীরিক শিক্ষাবিদগণ শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বেশ কয়েকটি অন্তর্বর্তী পদক্ষেপের কথা উল্লে খ করেছেন। এগুলোই শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষজ্ঞগণ কিছু উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হলেও কিছু উদ্দেশ্য নিযে মতের ভিন্নতাও প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। বিভিন্ন  চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা-

১. শারীরিক সুস্থতা অর্জন।

২. মানসিক বিকাশ সাধন।

৩. চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন।

৪. সামাজিক গুণাবলি অর্জন।